তারিখ ১৮ NOV 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক আমাদের সময়

শহীদ ইকবাল

স্কুলপর্যায়ে শিক্ষার হালচাল

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পর্যাপ্ত বললে অত্যুক্তি হয় না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি কিন্ডারগার্টেন, নার্সারি স্কুল, ক্যাডেট স্কুল, বিভিন্ন নামের শিশুনিকেতন বা কোচিং সেন্টারে লেখাপড়া চলছে। বেসরকারি উদ্যোগের পড়াশোনাও অপর্যাপ্ত বলা যাবে না। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা একপ্রকার বাজারও সৃষ্টি করে চলেছে। কার্যত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসার আগেই এখন শিশুদের কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হতে হয়। প্রথম শ্রেণিতে পৌঁছার আগেই তাকে পরীক্ষার বেঞ্চে বসতে হয় কয়েকবার। কার্যত এসব আজকালকার লেখাপড়া! তাতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগের যজ্ঞও কিছু কম নয়। এ পর্যায়ে সেবার আওতায় কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের বিতরণের কাজও চলছে। প্রযুক্তিকে দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রজেক্টের আওতায় এখন নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা স্কুলগুলোয় দিচ্ছে। কিন্তু বিপরীত হতাশাজনক চিত্রও কম নয়। কদিন আগে একটি পত্রিকায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা গেছে, 'সংকটে ২০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়।' সংকট কী? জেলায় জেলায় শত শত স্কুলের অবকাঠামোর নাজুক ও বিপর্যস্ত দশা। পলেস্তারা উঠে গেছে, পানি পড়ছে, সিলিং ধসে গেছে, পরিত্যক্ত ঘর সিল করে দেওয়া হয়েছে এমন হাজার রকমের সমস্যা, হাজার হাজার বিদ্যালয়ে। ফলে খোলা জায়গায় আকাশের নিচে পাঠদান চলছে। যেখানে ঘর আছে সেখানে বসার জায়গা নেই। স্থান সংকুলানের অবস্থা অধিক নাজুক। গাদাগাদি করে বা দাঁড়িয়ে শিশুরা ক্লাস করছে। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ পর্যাপ্ত নেই। শিক্ষকশূন্যতাও আছে। এসবের বাইরে খেলার মাঠ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলো-হাওয়ার অনুগত পরিবেশ দূরপরাহত– আমলে নেওয়াও যেন কঠিন। এখন প্রশ্ন হলো, শিক্ষার উন্নয়নে যে পদক্ষেপ তার গোড়ায় যে কত গলদ– তা কারো চোখে পড়ছে না– এমনটা কেন? বাইরের জলুস দিয়ে কতটা মৌলিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব! সেটি কী সমাধানযোগ্য? স্কুলে যদি মাথার ওপরে ছাদ না থাকে তাহলে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বরাদ্দ দিয়ে কী হবে! ক্ষণিক বৃষ্টিতেই যদি ছাদ চুয়ে জল পড়ে তবে বিভিন্ন ফিডিং প্রকল্প কতটা কাজে আসবে। সরকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াচ্ছে, প্রযুক্তিগত সেবার হাতও বাড়িয়েছে কিন্তু মৌলিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য যে অবকাঠামোর সুস্থ ব্যবস্থাপনা দরকার– সেদিকে মনে হয় নজর দিচ্ছে না। আমরা আসলে সবকিছু ফ্রেসলি বা নতুন করে করতে চাই, যা আছে তার সংস্কার বা ঝুঁকিমুক্ত করার পদক্ষেপ নিতে চাই না। এমন ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকেও বেশ উদাসীন হতে দেখা যায়। অনেকটা এরকম মনোভাব যে, 'সরকারি মাল দরিয়া মে ঢাল।' যাবে সরকারের যাবে আমার কী!

প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে, এটা অসত্য নয়। প্রাথমিক শিক্ষার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য আলাদা মন্ত্রণালয়ও রয়েছে। কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ সে অনুপাতে লক্ষণীয় মাত্রায় কম। শিক্ষা কী– সে প্রশ্নটি জাতির সামনে আনলে প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষা বা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কথা আসবে। এ পর্যায়ে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ভাতা দেওয়া হচ্ছে। অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তবে যে পরিমাণে আগ্রহী হয়ে উঠছে– প্রায় সে পরিমাণে না হলেও 'ড্রপ আউট' কিন্তু কম হচ্ছে না। কেন? শুধু আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনাই কিন্তু এখানে মুখ্য নয়। লেখাপড়াটা শিক্ষার্থীদের কাছে আগ্রহীমূলক করে তোলার ব্যাপার আছে। তা ঠিক হচ্ছে না। যোগ্য ও ব্রতশীল শিক্ষকের চরম অভাব। কারিকুলাম বদলায়, যুগোপযোগী করার ব্যাপারও থাকে। কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষকের অভাব রয়েছে। অর্থ-বাণিজ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে গ্রাস করেছে, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকরাও তা থেকে মুক্ত নন। দায়বোধের চেয়ে আর্থিক লাভালাভের প্রশ্নটি তাদের সামনে অধিক গুরুত্ববহ বৈকি। ভোগবাদী ও প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থায় কেউ এখন ত্যাগ পছন্দ করছে না। কারণ সমাজে ভোগের উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মমর্যাদার প্রশ্নটিও যুক্ত হয়ে গেছে। বাইরের চাকচিক্য আর জলুস তার সামাজিক মর্যাদার শামিল। কিন্তু কমিটমেন্ট বা ভালো কাজ সমাজে তেমন আশা জাগানিয়া কিছু দিতে পারছে না। এটি বোধ করি সার্বিক সমাজেরই সাধারণ চিত্র। সে জন্য শিক্ষকদের আলাদা বেতন-কাঠামোর প্রশ্নটি আসছে অনেকদিন থেকে। দুর্নীতি কমানোর জন্যই হোক বা শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণের জন্য হোক, শিক্ষকের যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করতে না পারলে ক্লাসরুমের পড়াশোনা ভালো হবে না। কিংবা অশিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াও কঠিন আছে। সরকার আধুনিকীকরণের চিন্তা করছে, কিন্তু তার সঙ্গে এসব মৌলিক প্রশ্নকে যুক্ত করার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে, সবার আগে শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে– যার কোনো বিকল্প নেই। আর এটি জাতি গঠনে পেতে পারে সর্বাধিক অগ্রাধিকার।

২

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার শক্ত ভিত্তি গড়ার বিকল্প কিছু নেই। যদি তা ধসে পড়ে তবে জাতিই মুখ থুবড়ে পড়বে। আরও নির্মম সত্য যেটি, সব লাভালাভের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে প্রাথমিক শিক্ষাকে। 'শিক্ষকতা ব্রত'– এটি কথার কথা নয়, কাজে প্রমাণ করতে হবে। এ জন্য সরকার গৃহীত যে পদক্ষেপগুলো তা অমূলক নয় কিন্তু অগ্রাধিকার কোনটি সেটি বুঝতে হবে। ফলে গুরুত্বটিও সেভাবেই অনুধাবন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় এখন নারীরা অনেকেই শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত এবং কেউ কেউ স্থানীয় পর্যায়ে পোস্টিং নিয়েছেন। এটি বিরূপ প্রভাব উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রচুর শিশু-কিশোর ভর্তি হচ্ছে কিন্তু পাঠদানের সুব্যবস্থা নেই। আর সঠিক পাঠদান করাও কঠিন। একজন শিশু-কিশোরের মনে ছাপ ফেলার

মতো দৃষ্টান্ত, যত্ন-স্নেহ দিয়ে সুবুদ্ধি দেওয়া কজন পারেন! অনেক ছেলেমেয়ের মাঝে বোধকরি তা সম্ভবও নয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর যে মনোবিকাশ, মনের মধ্যে বুনে দেওয়া যে স্বপ্ন সেটি তো শুধু বইপুস্তক পড়ে হবে না। সে জন্য ক্রিয়েটিভ কাজ ও অবসর দিতে হবে। কল্পনা করার অবকাশও দরকার। খোলা মাঠ, বিনোদন, বিতর্ক, মনীষীদের জীবনী পাঠ, সাংস্কৃতিক কাজের ভেতরে মননকে উসকে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষকরা অনেকেই এখন পিটিআই বা বিএড করেন। সে ট্রেনিং ক্লাসরুমে কতটুকু কাজে লাগান সেটাও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। এগুলো মনিটরিং খুব প্রয়োজন। ছোট শিশুদের শিক্ষণীয় বিষয় হবে ঠিক পুতুল খেলার মতোই। তার কল্পনাপ্রবণ মনে রূপকথার রূপ ধরা পড়তে হবে। সেটা শিক্ষকরাই গড়ে দিতে পারেন। এখন শিশুরা যে অনেক পুস্তক পড়ে তারও প্রয়োজন নেই। কারণ বিজ্ঞান-রাষ্ট্রনীতি-ভূগোল নিছক শিশুমনে চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কী! কচিমাথায় ভারী বা কঠিন বিদ্যা গৃহীত হয় না। জোর করে ঢুকানোও যায় না। এটা শিক্ষকদেরই বুঝতে হবে। এরূপ বিস্বাদ ও কঠোর কঠিন ভারিক্কিও ড্রপ-আউটের কারণ হতে পারে। কার্যত এ পর্যায়ে আমাদের দুটো সমস্যা– এক. অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি, দুই. উপকরণের অভাব। দুটোই সমাধানযোগ্য এবং এ লক্ষ্যে সরকারি কোষাগার থেকে অনেক অর্থও ব্যয় হচ্ছে কিন্তু যোগ্য কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। স্মরণে রাখতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষাটাই শিক্ষার মৌল ভিত্তি। এর ওপরই দাঁড়িয়ে আছে পুরো শিক্ষাকাঠামো। আর এই শিক্ষাকাঠামোই জাতি গঠন কিংবা মানবসম্পদ উন্নয়নের মূলশক্তি। তাই একে আলাদা নজরদারির আওতায় এনে কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করাটা জরুরি।

প্রাসঙ্গিকভাবে আরও একটি কথা না বললেই নয়। 'প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে বৈষম্য আছে তার অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক'– এটি ১৯৯৭ সালের শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের অংশবিশেষ। এটির এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। আদৌ হওয়ার সম্ভাবনাও কম। একটি দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে যদি এরকম বৈষম্যের পথ অবমুক্ত থাকে তবে জাতি গঠনে কিংবা সামষ্টিক সমৃদ্ধির স্বার্থের পরিণতি কী হবে– আমরা বুঝতেই পারছি। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা স্মরণ করি : 'আমাদের সমাজে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধিবিকারে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ।' এই সর্বনাশটি কী? কার্যত আমরা চাই, ভেতরের শুভবোধকে জাগিয়েই সমাজে শুভবোধ আনতে। কার্যত আমরা তা পারছি কী!

৩

একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলে শেষ করি। ছেলেবেলায় নামকরা যে স্কুলে নামজাদা শিক্ষকরা আমাদের পড়িয়েছিলেন তারা আর এখন কেউ নেই। কিন্তু স্কুলটি আছে। সে স্কুলের মাঠ অপরিকল্পিত-নবগঠিত বিল্ডিংয়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। সামনে-পেছনে জায়গা দখল করেছে পুঁজিপতিরা। গাছপালা নেই। বড় জাম বা বটগাছটি কেটে ফেলা হয়েছে অনেক আগেই। স্কুলের শিক্ষকদের এখন অনেকেই শিক্ষয়িত্রী– যারা সবাই এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা। স্কুলে গমন-বহির্গমনের কোনো নিয়ম নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'প্রাইমারির মাস্টারি করি... খালি যাই আর আসি।' এরকম প্রতীকী অভিজ্ঞতা এখন বাংলাদেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই। এ প্রাঙ্গণে মেধাবী ও আলোকময় জাতি গঠনের পথ কীভাবে অবমুক্ত হবে– তা প্রশ্নশীল। কিন্তু এ থেকে মুক্তি তো পেতেই হবে! ধসে পড়া বিল্ডিংয়ের সঙ্গে ধসে গেছে যে কিশোর মন– তাকে জাগাতে হবে। শিক্ষয়িত্রীর অবহেলায় যে দুরন্ত ছেলেটি নিজের জীবনকে অবহেলা করছে– তাকে পথ দেখাতে হবে– এর বিকল্প নেই। তবুও প্রশ্ন করি, এই কী রবীন্দ্রনাথের 'সর্বনাশ'? সরকারকে অধিক নজর দিতে হবে, কঠোরও হতে হবে। ডিজিটাল প্রজেক্টর আর কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থা অস্বীকার করছি না কিন্তু এ উপকরণগুলো চালাবেন যারা– মেইনটেইন করবেন যারা– তাদের শিক্ষকতায় অনুভূতিশীল হতে হবে। সর্বৈব এসব যন্ত্র সংরক্ষণের এবং শিক্ষার্থীদের হাতে কার্যকরভাবে তুলে ধরার যোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাটি কর্তাব্যক্তিরা একটু বাস্তবের চোখে দেখুন, সমস্যাগুলো সুরাহা করুন এবং তা কতটা কার্যকর ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায়– তাও ভাবুন। নইলে ঢাকঢাকগুড়গুড় করে কী লাভ! মনে রাখতে হবে 'সর্বনাশা' যা কিছু তাই কিন্তু 'কর্মনাশা'– এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। কারণ উন্নয়ন অভিমুখে বাংলাদেশের গতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অধিক কার্যকারিতার বিকল্প কিছু নেই। এ জন্যই শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া খুব জরুরি।

❑ **শহীদ ইকবাল**, অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
shiqbal70@gmail.com